সাহিত্যচর্চা

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক । একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ
এপ্রিল, ২০১৬
জানুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের অনুমতিতে নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হল তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মৃণ্ময় মিত্র (তেলেনাপোতা আবিষ্কার : প্রেমেন্দ্র মিত্র),
ড. গৌতম ভাদুড়ী (ডাকাতের মা : সতীনাথ ভাদুড়ী),
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (গালিলিও : সত্যেন্দ্রনাথ বসু),
কল্যাণী কাজী (দ্বীপান্তরের বন্দিনী : কাজী নজরুল ইসলাম)
জয় গোস্বামী (নুন : জয় গোস্বামী),
দে’জ পাবলিশিং (বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো : গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ/ অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়),
সাহিত্য অকাদেমি (শিক্ষার সার্কাস : আইয়াপ্পা পানিকর/ অনুবাদ : উৎপলকুমার বসু)।

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা** এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে **ভ্রাতৃত্বের ভাব,** গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে,** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND TO SECURE TO ALL ITS CITIZENS :**

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কর্তৃক নির্মিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত 'সাহিত্যচর্চা' সংকলনটি নবকলেবরে পরিবেশন করা হল। একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্মিত এই সংকলনটি বাংলা প্রথম ভাষা (ক)-এর পাঠ্যপুস্তক। নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রকাশিত 'সাহিত্যচর্চা' সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করানো। আমাদের সেই উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই সংকলনের মাধ্যমে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যেরও আস্বাদ পাচ্ছে। এখানে গতানুগতিকতা বা একঘেয়েমি এড়াতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। একই মলাটের মধ্যে আনা হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, বড়ো গল্প ইত্যাদি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের অনুদানে এই বইটি ২০১৬ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

সংকলনটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জানুয়ারি, ২০১৭
বিদ্যাসাগর ভবন

ড. মহুয়া দাস
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্র স্তা ব না

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত এবং রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত ‘বাংলা : প্রথম ভাষা’ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একাদশ শ্রেণির জন্য নির্বাচিত গদ্য, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক ইত্যাদির সংকলন প্রকাশিত হল।

বাংলা সাহিত্যের বিপুল বৈচিত্র্যের প্রতিফলনের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য ভাষাসাহিত্য ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিষয়ও এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে পাঠ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ‘গুরু’। ছাত্রছাত্রীদের বয়সের কথা মাথায় রেখে জোর দেওয়া হয়েছে আধুনিকতম সাহিত্যের উপর, কিন্তু তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ভুলে নয়।

সম্পূর্ণ নতুন এই সংকলনটির সঙ্গে প্রশ্নকাঠামো আর নম্বর বিভাজনেও এসেছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। শুরু হয়েছে প্রকল্প রচনার অভ্যাস। ২০১৩ সাল থেকে এই নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্ত হওয়ার পর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে আরো গভীরতর ও সর্বাঙ্গীন করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এই বইটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রয়াসের জন্য রাজ্য সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকেও।

সংকলনটির প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস কে। এছাড়াও যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জানুয়ারি, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

মহুয়া দাস
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)

রথীন্দ্রনাথ দে
(সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

স দ স্য

ঋত্বিক মল্লিক রুদ্রশেখর সাহা

প্র চ্ছ দ

সুব্রত মাজী

রূ পা য় ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূ | চি | প | ত্র

গল্প		**১-১৪**
কর্তার ভূত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
তেলেনাপোতা আবিষ্কার	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৬
ডাকাতের মা	সতীনাথ ভাদুড়ী	১৪
প্রবন্ধ		**২১-৩৪**
সুয়েজখালে : হাঙর শিকার	স্বামী বিবেকানন্দ	২৩
গালিলিও	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	২৯
কবিতা		**৩৫-৪৫**
নীলধ্বজের প্রতি জনা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩৭
বাড়ির কাছে আরশিনগর	লালন ফকির	৪০
দ্বীপান্তরের বন্দিনী	কাজী নজরুল ইসলাম	৪১
নুন	জয় গোস্বামী	৪৪
আন্তর্জাতিক গল্প		**৪৫-৫৪**
বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো	গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	৪৭
ভারতীয় কবিতা		**৫৫-৫৮**
শিক্ষার সার্কাস	আইয়াপ্পা পানিকর	৫৭
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ		**৫৯-৯৬**
গুরু	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬১
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি		৯৭

গল্প

কর্তার ভূত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, ‘তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।’

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, ‘আমি গেলে এদের ঠান্ডা রাখবে কে।’

তা বলে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, ‘ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।’

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেন না ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারও জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, ‘এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সব চেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।’

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভুতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠান্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিচ্ছুই না থাক—অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক—শান্তি থাকে।

কত-যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেন-না ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

৩

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারও মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেই হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায়নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায়নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

৪

এদিকে দিব্যি ঠান্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল'।

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, 'এমন হল কেন।'

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, 'এটা ভূতের দোষ নয়, ভুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।'

শুনে সকলেই বললে, 'তা তো বটেই।' অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, 'খাজনা দাও'। আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, 'খাজনা দাও।'

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে 'খাজনা দেব কীসে।'

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারও হুঁশ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, 'বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।'

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কীসে'।

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।'

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরো একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, 'ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।'

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, 'কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনিনি। তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে—সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?'

প্রশ্নকারী বলে, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।'

মাসিপিসি বলে, 'বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।'

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, 'যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।'

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, 'চুপ। এখনো ঘানি অচল হয়নি।'

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, 'কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয়নি।'

কর্তা বলেন, 'ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।'

তারা বলে, 'ভয় করে যে কর্তা।'

কর্তা বলেন, 'সেইখানেই তো ভূত।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকারদের একজন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা জন্ম দিয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের, যা পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পায়। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অন্ধ গোঁড়ামির বিরোধিতা ও নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানানো তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ *ভারতী*, *হিতবাদী*, *সাধনা* প্রভৃতি পত্রিকার জন্য ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। শিলাইদহে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জমিদারি পরিদর্শনকালে তিনি খুব কাছ থেকে গ্রামীণ বাংলা ও সাধারণ মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের সেই অপরূপতা ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে রয়েছে *দেনাপাওনা*, *কাবুলিওয়ালা*, *গুপ্তধন*, *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*, *ক্ষুধিত পাষাণ*, *ছুটি*, *ল্যাবরেটরী*, *সুভা*, *নষ্টনীড়*, *অতিথি*, *খাতা*, *হৈমন্তী*, *বলাই*, *পোস্টমাস্টার*, *মধ্যবর্তিনী* প্রভৃতি। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ' সংকলনগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়, আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে, কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে-মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে নীচু একটা জলার মতো জায়গার উপর দিয়ে ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন, সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনো দিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নীচের জলা থেকে একটু ক্রুর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু-ধারে বাঁশঝাড় আর বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দুজন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে, কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনে নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন। মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড়ো রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কিনা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদাজলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভিতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি। মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ির এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কীভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য, কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথাও ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্জনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছইয়ের ভিতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে, আজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।

ব্যাপারটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা, কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র, এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হলে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কী করে সম্ভব, আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সেসব ধ্বংসাবশেষ— কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে; জাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে নবোদিত চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক এক কলশি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গিয়েছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পানরসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের উপর কোনোরকমে শতরঞ্জির আবরণ পড়তে-না-পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকাধ্বনি করতে করবেন, অপরজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কুলীন, ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে উপরের ছাদে উঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি উপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে অলিসা ভেঙে ধুলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভিতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে এই মৃত্যু সুসুপ্তি মগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি

রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনার চোখে পড়বে। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই, আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিকবাদে মনে হবে, সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে ছায়া সরে গিয়েছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গিয়েছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গিয়েছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নীচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন, এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়ি-পানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে-পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আপনাকে বিদ্রুপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাতনাটার উপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস, ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাতনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন, একটি মেয়ে পিতলের ঝকঝকে কলশিতে পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাতনা লক্ষ করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে কলশিটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলশি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন কেন? টান দিন।'

সে কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে, এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাতনা আবার ভেসে উঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে এবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর

পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গিয়েছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গিয়েছে। মাছেরা আপনার শক্তি -সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন, আপনার মৎস্যশিকার নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ কাহিনি কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়তো আপনার পানরসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন, 'কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!'

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে পুকুর ঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পানরসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেইসঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই, আপনি আগেই লক্ষ করেছেন, শুধু কাছ থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন-বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। উপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠছে মনে হবে, সেইসঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে যে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, 'একটু এখানে শুনে যাও মণিদা।'

মণিদা আপনার সেই পানরসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতর স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কী যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কী বলব!'

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, ‘ওঃ সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?’

‘হ্যাঁ, কেবলই বলছেন, “সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস?” কী যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্যতা বেড়েছে যে, কোনো কথা বোঝালে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে, তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে!’

‘হুঁ, এ তো বড়ো মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে, যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।’

উপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, ‘তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠান্ডা করতে পারো।’

‘আচ্ছা, তুই যা, আমি আসছি।’ মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, ‘এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত-পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।’

ব্যাপারটা কী এবার আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, ‘ব্যাপার আর কী! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূর-সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে ছোকরা এসে ওঁকে বলে গিয়েছিল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর-পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।’

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, ‘নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?’

‘আরে, সে বিদেশে গিয়েছিল কবে যে ফিরবে! নেহাত বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাকে এই ধাপ্পা দিয়ে গিয়েছিল। এমন ঘুঁটে-কুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে-থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হলে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?’

‘যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?’

‘তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় তো নেই। যাই, কর্মভোগ সেরে আসি।’ বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো বলে ফেলবেন, ‘চলো আমিও যাব।’

‘তুমি যাবে’! মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

‘হ্যাঁ। কোনো আপত্তি আছে গেলে?’

‘না আপত্তি কীসের!’ বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরটিতে আপনি পৌঁছোবেন, মনে হবে উপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোশে ছিন্ন-কন্থা-জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে, ‘কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল বাবা? তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন করে পালাবি না?’

মণি কী যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, ‘না মাসিমা, আর পালাব না।’

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থানুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভিতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। কটি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে, আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, ‘আমি জানতাম, তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনছি।’

বৃদ্ধা কথা বলে হাঁফাবেন, চকিতে একবার যামিনীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কী ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে, ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, ‘যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই, তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ, দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এর মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কী না করছে!’

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোটো একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, ‘যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা? তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।’

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, ‘আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।’

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে, ‘আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!’

আপনি হেসে বলবেন, ‘থাক-না। এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে?’

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভিতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশো না দেড়শো বছর আগে প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। যেসব কথা ভালো করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে শুনবেন, 'ফিরে আসব, ফিরে আসব।'

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছোবেন তখনো আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটোখাটো বাধা-বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমেছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন, সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে লেপ-তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, 'ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?' আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। অস্ত যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশার কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। পিতার রেলের চাকরির সুবাদে ভারতের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনে সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। তীক্ষ্ণধার ভাষা আর তির্যক ভঙ্গি তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শ্লেষের তির বা সামাজিক-রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ : *বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, পঞ্চশর, অফুরন্ত, জলপায়রা,ধূলিধূসর, মহানগর, সপ্তপদী, নানা রঙে বোনা*। *শুধু কেরানী, মোট বারো, পুন্নাম, শৃঙ্খল, বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে* প্রভৃতি তাঁর লেখা অবিস্মরণীয় ছোটোগল্প। তাঁর লেখা বিজ্ঞান-নির্ভর রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে *পিঁপড়ে পুরাণ, মঙ্গলবৈরী, পৃথিবীর শত্রু, করাল কীট, ময়দানবের দ্বীপ* প্রভৃতি। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরাণী'। তিনি 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, লিখেছেন সুধীরচন্দ্র সরকারের 'মৌচাক' পত্রিকায়। ঘনাদা, মামাবাবু, ভূত-শিকারি মেজকর্তা এবং গোয়েন্দা-কবি পরাশর বর্মা প্রভৃতি তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি বিখ্যাত চরিত্র।

ডাকাতের মা

সতীনাথ ভাদুড়ী

আগে সে ছিল ডাকাতের বউ। সৌখীর বাপ মরে যাবার পর থেকে তার পরিচয় ডাকাতের মা বলে। ...ডাকাতের মায়ের ঘুম কি পাতলা না হলে চলে! রাতবিরেতে কখন দরজায় টোকা পড়বে তার কি ঠিক আছে! টকটক করে দু-টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরও একবার হলে বুঝতে হবে যে, সৌখী নিজে বাড়ি ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম— 'তখনই দরজা খুলবি না হুট করে! খবরদার! দশবার নিশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি। তারপর দরজা খুলবি।' ...আরও কত রকমের টোকা মারবার রকমফের আছে। কতবার হয়েছে, কতবার বদলেছে। দুনিয়ায় বিশ্বাস করবে কাকে; পুলিশকে ঠেকানো যায়; কিন্তু দলের কারও মনে যখন পাপ ঢোকে তখন তাকে ঠেকানো হয় মুশকিল। দিনকালই পড়েছে অন্যরকম! সৌখীর বাপের মুখে শোনা যে, সেকালে দলের কে যেন জখম হয়ে ধরা পড়বার পর, নিজের হাতে নিজের জিব কেটে ফেলেছিল— পাছে পুলিশের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে। আর আজকাল দেখো! সৌখী জেলে গিয়েছে আজ পাঁচ বছর; প্রথম দু বছর দলের লোক মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেত; তিন বছর থেকে আর দেয় না। এ কী কখনও হতে পারত আগেকার কালে? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের পাটই কী একেবারে উঠে গেল দুনিয়া থেকে? সৌখীর বাপ কতবার জেলে গিয়েছে; সৌখীরও তো এর আগে দু-বার কয়েদ হয়েছে; কখনও তো দলের লোকে এর আগে এমন ব্যবহার করেনি। মাস না যেতেই হাতে টাকা এসে পৌঁছেছে— কখনও বা আগাম—তিন-চার মাসের একসঙ্গে। কিন্তু এবার দেখো তো কাণ্ড! একটা সংসার পয়সার অভাবে ভেসে গেল কিনা তা একবার উঁকি মেরে দেখল না দলের লোক! আগের বউমার শরীরটা ছিল ভালো। সৌখীর এবারকার বউটা রোগা-রোগা। তার উপর ছেলে হবার পর একেবারে ভেঙে গিয়েছে শরীর। সৌখী যখন একবার ধরা পড়ে, তখন বউমার ছেলে পেটে। হ্যাঁ, নাতিটার বয়স চার-পাঁচ বছর হল বইকি। কী কপাল নিয়ে এসেছিল! যার বাপের নামে চৌকিদারসাহেব কাঁপে, দারোগাসাহেব পর্যন্ত যার বাপকে তুইতোকারি করতে সাহস করেননি কোনোদিন, তারই কিনা দু-বেলা ভাত জোটে না! হায় রে কপাল! এ বউ যে খাটতে পারে না ওই রোগা শরীর নিয়ে। আমি বুড়ো মানুষ, কোনোরকমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুটো খই-মুড়ি বেচে আসি। তা দিয়ে নিজের পেট চালানোই শক্ত। সাধে কী আর বউমাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল! তাছাড়া গয়লাবাড়ির মেয়ে। ঝি-চাকরের কাজও তো আমরা করতে পারি না। করলেই বা রাখত কে? সৌখীর মা-বউকে কি কেউ বিশ্বাস পায়! নইলে আমার কি ইচ্ছা করে না যে, বউ-নাতিকে নিয়ে ঘর করি! বেয়াইয়ের দুটো মোষ

আছে। তবু বউ-নাতিটার পেটে একটু একটু দুধ পড়ছে। ওদের শরীরে দরকার দুধের। আর বছরখানেক বাদেই তো সৌখী ছাড় পাবে। তখন বউকে নিয়ে এসে রুপোর গয়না দিয়ে মুড়ে দেবে। দেখিয়ে দেব পাড়ার লোকদের যে, সৌখীর মায়ের নাতি পথের ভিখিরি নয়। আসতে দাও না সৌখীকে! দলের ওই বদলোকগুলোকেও ঠান্ডা করতে হবে! আমি বলি, এসব একলসেঁড়ে লোকদের দলে না নিলেই হয়। ওরা কী ডাকাত নামের যুগ্যি; চোর, ছিঁচকে চোর! ওই যেটা টাকা দিতে আসত, সেটার চেহারা দেখেছ? তালপাতার সেপাই। থুতনির নীচে দু-গাছা দাড়ি! কালি-ঝুলিই মাখো, আর মশালই হাতে নাও, ওই রোগা-পটকাকে দেখে কেউ ভয় পাবে কস্মিনকালে?...

ঘুম আর আসতে চায় না। রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোনো কালেই ঘুম হয় না শীতের দিনে। ...একবার সৌখী কোথা থেকে রাত-দুপুরে ফিরে এসে টোকার সাড়া না পেয়ে, কী মারই মেরেছিল মাকে! বলে দিয়েছিল যে ফের যদি কোনোদিন নাকমুখ ঢেকে শুতে দেখি, তাহলে খুন করে ফেলে দেব! বাপের বেটা, তাই মেজাজ অমন কড়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেও একটা বকুনি দেবার লোক পর্যন্ত নেই বাড়িতে, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে! এ কী কম দুঃখের কথা।...

ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে এক দিনের জন্যও নাকমুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে।

...বাইরে নোনা আতা গাছতলায় শুকনো পাতার উপর একটু খড়খড় করে শব্দ হল। গন্ধগোকুল কিংবা শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়। কী খেতে যে এরা আসে বোঝা দায় ...বুড়ো হয়ে শীত বেড়েছে। আগে একখান কম্বলে কেমন দিব্যি চলে যেত। এ কম্বলখানা হয়েওছে অনেক কালের পুরোনো। এর আগের বার সৌখী জেল থেকে এনেছিল। সে কী আজকের কথা!

কম্বলখানার বয়স ক-বছর হবে তার হিসাব করতে গিয়ে বাধা পড়ে। টকটক করে টোকা পড়ার মতো শব্দ যেন কানে এল। টিকটিকির ডাক বোধ হয়! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! টিকটিকিটা সুদ্ধ খুনশুড়ি আরম্ভ করেছে মজা দেখবার জন্য। করে নে।

টকটক করে আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল।

...না। তাহলে টিকটিকি না তো। আওয়াজটা খনখনে—টিনের কপাটের উপর টোকা মারবার শব্দ!

বুড়ি উঠে বসে। ঘর গরম রাখার জন্য সে আগুন করেছিল মেঝেতে, সেটা কখন নিভে গিয়েছে; কিন্তু তার ধোঁয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করে তুলেছে।... এতদিনে কী তাহলে দলের হতভাগাগুলোর মনে পড়েছে সৌখীর মায়ের কথা?

আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল। আর সন্দেহ নেই! অনেক দিনের অনভ্যাসের পর এই সামান্য ব্যাপারটা বুড়ির মনের মধ্যে একটু উত্তেজনা এনেছে।

...তবু বলা যায় না। ...কে না কে...

সৌখীর মা আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল। ...লোকটাও বোধ হয় কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা

করছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। বিড়ির গন্ধ নাকে আসছে। ...আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তাহলে তো লোকটা টাকা দিতে আসেনি! পুলিশের লোকটোক নয় তো? টোকা মারবার নিয়মকানুনগুলো হয়তো ভালো জানে না! ...সৌখীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরি! ...নিশ্চয়ই পুলিশের লোক! তবে তুমি যে-ই হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তারপর অন্য কথা। ...কথা বলতে হবে সাবধানে; দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজান্তে।...

হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিশ্বাস ফেলবার কথা। মানসিক উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছেই না তা গুনবে কী। ...বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি দশবার নিশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল।

'কে?'

দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছমছম করে।

'ঘর যে একবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢুকি কী করে?'

'কে, সৌখী। ওমা তুই। আমি ভাবি কে না কে।'

বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে। ...এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একই রকম থেকে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা-র সঙ্গে খুনশুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ। ...এ আনন্দ তার রাখবার জায়গা নেই।...

'লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশি আর কী। হেড জমাদার সাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সেই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলারবাবুর কাছে। তাই বেশি রেমিশন পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তুই কুপিটা জ্বাল তো আগে। তারপর সব কথা হবে।'

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সৌখী যাতে ঘরের অন্য সকলেও শুনতে পায়। তারপর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তুলে ধরে।

বুড়ি এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক ধরেছে এবার; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগা-রোগা লাগছে যেন। সৌখীটার তো বাপের মতো জেলে গেলে শরীর ভালো হয়। তবে এবার এমন কেন? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেয়াল পর্যন্ত কী যেন খুঁজছে। কাদের খুঁজছে সে কথা আর বুড়িকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না।...

'হ্যাঁরে, জেলে তোর অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

সৌখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না; জিজ্ঞাসা করে, 'এদের কাউকে দেখছি না?'

প্রতি মুহূর্তে বুড়ি এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল। জানা কথা যে, জিজ্ঞাসা করবেই; ...তবু...

'বউ বাপের বাড়ি গিয়েছে।'

'হঠাৎ বাপের বাড়ি?'

...এতদিন পর বাড়ি ফিরেছে ছেলে। এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে চায় না। মরদের রাগ। শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে রাগের মাথায় দলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

...নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথাও এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সৌখী। আগের বউটার ছেলেপিলে হয়ইনি। এ বউয়ের ওই একটিই তো টিমটিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সৌখী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারব না? খেয়ে-দেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক-আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে।...

'কেন, মেয়েদের কী মা-বাপকে দেখতে ইচ্ছে করে না একবারও?'

'না না, তাই কী বলছি নাকি?' অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশি সৌখী। তার বাড়ি ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টোকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল রাত নটার মধ্যে দুরন্ত ছেলেটা নিশ্চয়ই ঘুমোবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে...কালই সে যাবে শ্বশুরবাড়ি বউছেলেকে নিয়ে আসতে। এ কথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভালো দেখায় না; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে।...মা কত কী বলে চলেছে; এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।

'নে, হাতমুখ ধুয়ে নে।'

'না না। আমি খেয়ে এসেছি। এই রাত করে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।'

'না, রাঁধছে কে। খইমুড়ি আছে। খেয়েনে। তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না।'

ব্যবসার পুঁজি খইমুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মা-র গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে।

'ওখান আমাকে দে।'

আপত্তি ঠেলে সৌখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল।

নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ির ঘুম আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। সৌখীর নাকডাকানির একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ি এল; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে, তা নয়, সৌখীকে কী খেতে দেবে কাল সকালে, সেই হয়েছে বুড়ির মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না হয় বিক্রির খইমুড়ি দিয়ে কোনোরকমে চলে গেল।...যদি বলত দুটো ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তাহলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না বলে।...আলু-চচ্চড়ি খেতে কী ভালোই বাসে সৌখীটা! কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি। আলু, চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কী ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা জোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব!...

...কাছারির ঘড়িতে দুটো বাজল।...ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।...

মনে পড়ল যে, পেশকারসাহেবের বাড়ি রাজমিস্ত্রি লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে, পড়ে-যাওয়া উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে। বুড়ি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরোল ঘর থেকে।

মাতাদিন পেশকারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর ভাঙা ইটের পাহাড় নীচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ভাঙতে বুড়ির বিশেষ অসুবিধা হল না।... বাড়ি নিশুতি!...

অন্ধকারে কী কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোরগোড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকার সাহেবের খড়মজোড়া, আর জলভরা ঘটি—ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে।

ভয়ে বুড়ি উঠোনের আর কোথায় কী আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটি তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জলটুকু পর্যন্ত ফেলেনি।... এখন রাতদুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারকয়েক লোটা না মাজলে মাতাদিন পেশকারের হাত নিশপিশ করে। সেইজন্য হুলস্থূল পড়ে গেল তাঁর বাড়িতে সকালবেলায়।

খোকার মা নাকে কেঁদে স্বামীকে মনে করিয়ে দিলেন যে, লোটা হল বাড়ির লক্ষ্মী; ...এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে।—'বাজে বক্‌বক্ কোরো না। তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিশকে না দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে; সে খবর রাখো?'

আইনচঞ্চু মাতাদিন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।

ফিরতিমুখো তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানা রকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া গেল না। পেশকারসাহেব বড়ো খুঁতখুতে লোটা সম্বন্ধে। তিনি চান খুরো-দেওয়া লোটা—বুঝলেন কিনা—এই এত বড়ো সাইজের—মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি মোটা রুপোর কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য। ...দোকানদার শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'পুরোনো হলে চলবে? নামেই পুরোনো। সস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।'

'পুরোনো বাসনও বিক্রি হয় নাকি এখানে? দেখি।'

ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমা জোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন। ...খুরোর নীচে ঠিক সেই তারা আঁকা! আর সন্দেহ নেই!...

মাতাদিন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুটি চেপে ধরেন। —'বল! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকানদারি—আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে!'

একেবারে হই-হই-রই-রই কাণ্ড। দোকানে লোক জড় হয়ে গেল। দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দো আনা পয়সা গুনে, সৌখীর মায়ের কাছ থেকে—এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে।

'চোদ্দো আনায় এই ঘটি পাওয়া যায়? চোরাই মাল জেনেই কিনেছিস! চোরাই মাল রাখবার ফৌজদারি ধারা জানিস?'

পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন একজন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগাসাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার

শুনে তিনি সদলবলে সৌখীর বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সৌখীর মা আলুর তরকারি চড়িয়েছে উনোনে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে।

অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সৌখী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে সে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না।

দারোগা-পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে। পুলিশ দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিশকে তাদের বাড়িতে হানা দিতে দেখেছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদিন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিশের সঙ্গে রয়েছে! তার যে ধারণা ছিল, বাসনওলা পুরোনো বাসনগুলোকে রং-চং দিয়ে নতুনের মতো না করে নিয়ে বিক্রি করে না... পাঁচ-সাত বছর আগে পুলিশ একবার ভোররাত্রে তাদের বাড়ি ঘেরাও করছিল, বন্দুকের খোঁজে। তখন তো মাথা হেঁট হয়নি তার। ডাকাতি করা তার স্বামী পুত্রের হকের নেশা। সে তো মরদের কাজ; গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সেক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি মাত্র—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এ যে চুরি! ...ছিঁচকে চোরের কাজ, শেষকালে...

লজ্জায় সৌখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে!

দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে, 'তুই এই লোটা আজ বাজারে বাসনের দোকানে চোদ্দো আনায় বিক্রি করেছিস।'

কোনো জবাব বেরোল না বুড়ির মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সে মাথা হেঁট করে নিল।

এতক্ষণে বোঝে সৌখী ব্যাপারটা। চোদ্দো আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল! ...কেন মা তাকে বলল না! ...এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকেদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েছে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার!... বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল। ...কিন্তু সে সময় পেল কই? রাতে এসে শুয়েছে; এতক্ষণ তো বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি। ...শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! জেলের মধ্যে ওই সব ছিঁচকে 'কদুচোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোনো দিন!... ডাকাতরা জেলে আলাপ-সালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, এ কথা তো মায়ের অজানা নয়।... 'কদুচোর'দের যে মাত্র দু-মাস তিন মাসের সাজা হয়।... মা কি জানে না যে...

'এই বুড়ি! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? বল। জবাব দে।'

বুড়ি নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কী না, সে কথা বোঝাও যার না তার মুখ দেখে।

আর থাকতে পারল না সৌখী।

'দারোগাসাহেব, মেয়েমানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাত্রে।'

বিজ্ঞ দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেনে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সৌখীদের ঘুমোতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ির মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষণ।

এইবার সৌখীর মা ভেঙে পড়ল।...ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে।...

'না না দারোগাসাহেব! সৌখী করেনি, আমি করেছি। ওকে গ্রেপ্তার করবেন না। আমাকে করুন। ও কিছু জানে না। ও যে ঘুমুচ্ছিল। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ-ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর।...'

দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ি।

কিন্তু তিনি বাসনওলা কিংবা এই বুড়িটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না; তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সৌখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।

মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনোনে চড়ানো আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) : জন্ম বিহারের পূর্ণিয়ায়। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পর আইন পাশ করে আইনজীবী বাবার সঙ্গে কিছুকাল ওকালতি করেন। পরে সেই কাজ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে দীর্ঘ সময় কারাবাস করেন। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। ১৯৪৫-এ রচিত উপন্যাস 'জাগরী' তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। এই গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারও পান (১৯৫০)। এছাড়াও '*ঢোঁড়াই চরিতমানস*', '*চিত্রগুপ্তের ফাইল*' প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর ছোটোগল্পগুলিও জোরালো বক্তব্য ও ভাষার জন্য সমান জনপ্রিয়। তাঁর গল্পসংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে *গণনায়ক, অপরিচিতা, চকাচকী, পত্রলেখার বাবা, জলভ্রমি* প্রভৃতি। তাঁর গল্পে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

প্রবন্ধ

সুয়েজখালে : হাঙগর শিকার

স্বামী বিবেকানন্দ

১৪ জুলাই রেড-সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল। সামনে সুয়েজখাল। জাহাজে সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপরে এসেছেন মিশরে প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ সম্ভবত — কাজেই দোতরফা ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎছাঁতের ন্যাটার কাছে আমাদের দিশি ছুঁৎছাত কোথায় লাগে! মাল নাববে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পারবে না। জাহাজে খালাসি বেচারাদের আপদ আর কী! তারাই কুলি হয়ে ক্রেনে করে মাল তুলে, আলটপ্‌কা নীচে সুয়েজি নৌকায় ফেলছে— তারা নিয়ে ডাঙায় যাচ্চে। কোম্পানির এজেন্ট ছোটো লঞ্চে করে জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্ছে। এ তো ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমি— প্লেগ আইন-ফাইন সকলের পার— এখানে ইউরোপের আরম্ভ। স্বর্গে ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আয়োজন। প্লেগ-বিষ—প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে—ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু মিশরি আদমিকে ছুঁলেই আবার দশ দিন আটক—তাহলে আর নেপল্‌সেও লোক নাবানো হবে না, মার্সাইতেও নয়; কাজেই যা কিছু কাজ হচ্ছে, সব আলগোছে; কাজেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, ব্যাস্ — দশ দিন কারাঁটিন্ (quarantine)। কাজেই রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা এইখানে পড়ে থাকো— সুয়েজ বন্দরে।

এটি বড়ো সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়— জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই বন্দরে আর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই—বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের ওপর মানুষেরও জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড়ো বড়ো হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি— গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেন্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর-মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়োই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মতো এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোটো মাছ জলে থিক্ থিক্ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড়ো মাছ, অনেকটা ইলিশ মাছের চেহারা, তিরের মতো

এদিক ওদিক করে দৌড়োচ্ছে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙগরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়, ওর নাম বনিটো। পূর্বে ওর বিষয় পড়া গেছিল বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন হুড়ি চড়ে —তাও পড়া ছিল। ওর মাংস লাল ও বড়ো সুস্বাদ —তাও শোনা আছে। এখন ওর তেজ আর বেগ দেখে খুশি হওয়া গেল। অত বড়ো মাছটা তিরের মতো জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাচের মতো জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। বিশ মিনিট, আধঘণ্টা টাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোটো মাছের কিলিবিলি তো দেখা যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার —ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময়ে একজন বললে — ওই ওই! দশ বারোজনে বলে উঠল— ওই আসছে, ওই আসছে! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো বস্তু ভেসে আসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগল। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল, বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসছে— আর আগে আগে দু-একটা ছোটো মাছ; আর কতকগুলো ছোটো মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনোটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বস্‌ছে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্ছে, তাদের নাম 'আড়কাটি— পাইলট ফিস্‌।' তারা হাঙ্গর শিকার দেখিয়ে দেয় আর বোধ হয় প্রসাদটা-আসাদটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশি সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশেপাশে ঘুরছে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙ্গর-'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চ্যাপটা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরেজি অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি-কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলিকাটাকাটা। সেই জায়গাটা ওই মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপসে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে পিঠে চড়ে চলছে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায়-পারিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোটো হাতসুতোয় ধরা পড়ল। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে বা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপসে উঠতে লাগল; ওই রকম করে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেন্ড কেলাসের লোকগুলির বড়োই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক— তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটি ভীষণ বঁড়শির জোগাড় করলে, সে 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। চার হাত বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর ফাতনা সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ করে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে একখান পুলিশের নৌকা— আমরা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল, পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোনোরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড়ো বন্ধু হয়ে উঠল। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কী একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার জোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে এত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে — কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ ধ্বনি। তখন তিনি নিশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে একটা বল্লির ডগায় করে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে তো দূরে ফেললেন; আর আমরা উদগ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ওই আসে ওই আসে— শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ওই প্রকার ধড়্‌ফড়্‌ করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো— অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এল'। কিন্তু

সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ' হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মশকের আকার কী একটা ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে, 'ওই হাঙ্গর, ওই হাঙ্গর' — রব। 'চুপ চুপ্ — ছেলের দল! হাঙ্গর পালাবে।' 'বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়কে যাবে' — ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শিসংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্যে, পালভরে নৌকার মতো সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে। সে ভীম পুচ্ছ একটু হেলল— সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকল, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শিমুখো দাঁড়াল। আবার সোঁ করে আসছে—ওই হাঁ করে বঁড়শি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়ল, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চলল। আবার ওই চক্র দিয়ে আসছে, আবার হাঁ করছে; ওই— টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার —ওই ওই চিতিয়ে পড়ল; হয়েছে, টোপ খেয়েছে —টান টান টান, ৪০/৫০ জনে টান, প্রাণপণে টান। কী জোর মাছের! কী ঝটাপট— কী হাঁ। টান টান। জল থেকে এই উঠল, ওই যে জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্চে, টান টান। যাঃ, টোন খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল। তাই তো হে, তোমাদের কী তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েছে অমনি কি টানতে হয়? আর —'গতস্য শোচনা নাস্তি', হাঙ্গর তো বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটি মাছকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তা খবর পাইনি, মোদ্দা— হাঙ্গর তো চোঁচা। আবার সেটা ছিল 'বাঘা' — বাঘের মতো কালো কালো ডোরা কাটা। যা হোক্ 'বাঘা' বঁড়শি সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স-'আড়কাটি' - 'রক্তচোষা' অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই —ওই যে পলায়মান 'বাঘার' গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাব্ড়ামুখো' চলে আসছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই। নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বলত, 'দেখো হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড়ো সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কী শক্ত হাড়! এতকার হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম জানোয়ার — জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-টুকরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম! এই দেখো না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কী হয়েছে'—বলে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে —চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠান্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোনো-না-কোনোটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোনো প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়? —অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাব্ড়াকে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্‌কে হেসে, 'ভালো আছ তো হে' বলে সরে গেল। —'আমি একাই ঠকব?'

'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা....' শঙ্খধ্বনি তো শানা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস্' আর পাছু পাছু পকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাব্ড়া', তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কী ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটেছে তা 'থ্যাব্ড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা— এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রং-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!

এবার সব-চুপ —নোড়ো চোড়ো না, আর দেখো — তাড়াতাড়ি করো না। মোদ্দা— কাছির কাছে কাছে থেকো। ওই বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ চুপ — এইবার চিত হল— ওই যে আড়ে গিলছে; চুপ — গিলতে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' অবসর-ক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর উপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান— কাছি ধরে দে টান। ওই হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল— টান ভাই টান। ওই যে — প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের উপর! বাপ কী মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান —ওই সবটাই জল ছাড়িয়েছে। ওই যে বঁড়শিটা বিঁধেছে — ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড় — টান। থামথাম — ও আরব পুলিশ-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো— নইলে যে এত বড়ো জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান — কী ভারী হে? ও মা, ও কী? তাই তো হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কী? ও যে নাড়ি-ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরোল যে! যাক, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান ভাই টান। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান— এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার— আর ওই ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড় — ধুপ! বাবা, কী হাঙ্গর! কী ধপাস করেই জাহাজের উপর পড়ল! সাবধানের মার নেই — ওই কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ওহে ফৌজি-ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। 'বটে তো'। রক্ত মাখা গায়-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম দুম দিতে লাগল হাঙ্গরের মাথায় আর মেয়েরা 'আহা কী নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চিৎকার করতে লাগল— অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হলে, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগল, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ছিন্নহৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগল, নড়তে লাগল; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো এক রাশ বেরুলো — সেসব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগল।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেন্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসি স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভুমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযাগ হয়ে ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যাবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মতো কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মশলার স্থান— ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ওই জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত; একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে আর একটি জলপথে রেড-সি হয়ে। সিকন্দর শা ইরান-বিজয়ের পর নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধু নদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরান গ্রিস রোম

প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বাস (Christophoro Columbo) আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করার চেষ্টা করেন, ফল — আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যেই আমেরিকায় আদিম নিবাসীরা এখনও 'ইন্ডিয়ান' নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধুনদের 'সিন্ধু' 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানিরা তাকে 'হিন্দু' গ্রিকরা 'ইন্ডুস' করে তুললে; তাই থেকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়াল — কালা (খারাপ), যেমন এখন — 'নেটিভ'।

এদিকে পোর্তুগিজরা ভারতের নূতন পথ — আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব— সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড়ো জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। এ কথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না; ভারত — নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়ব? ভেবে দেখো—কথাটা কী? ওই যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোটো জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমরা নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রিস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া বোগদাদ, সমরখন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসি, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি? —কে ভাবে এ কথা। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দু-খানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন — তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি— তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরিবরা ঘর দুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড়ো কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য — সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! — তোমাদের প্রণাম করি।

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিস। প্রাচীন মিশরের ফেরো বাদশাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা খাতের দ্বারা সংযুক্ত করে উভয়সমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈয়ার হয়। মিশরে রোমরাজ্যের শাসনকালেও মধ্যে ওই খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু মিশর বিজয় করে ওই খাতের বালুকা-উদ্ধার ও অঙ্গপ্রতঙ্গ বদলে এক প্রকার নূতন করে তোলেন।

তারপর বড়ো কেউ কিছু করেননি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসর-খেদিব ইস্মায়েল ফরাসিদের পরামর্শে অধিকাংশ ফরাসি অর্থে এই খাত খনন করান। এ খালের মুশকিল হচ্ছে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃপুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড়ো বাণিজ্য-জাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্য-জাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন একখানি জাহাজ যাচ্ছে আরো একখানি আসছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে — এই জন্যে সমস্ত খালটি কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগের দুই মুখে কতকটা স্থান এমনভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া আছে, যাতে দুই তিনখানি জাহাজ একত্র থাকতে পারে। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল স্টেশনের মতো স্টেশন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটি খালে প্রবেশ করা মাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসছে, কখানি যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে তারা কে কোথায়— তা খবর যাচ্ছে এবং একটি বড়ো নকশার উপর চিহ্নিত হচ্ছে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে, এজন্য এক স্টেশনের হুকুম না পেলে আর এক স্টেশন পর্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসিদের হাতে। যদিও খাল-কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরেজদের, তথাপি সমস্ত কার্য ফরাসিরা করে— এটি রাজনৈতিক মীমাংসা।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) : জন্ম কলকাতার সিমুলিয়ায়। প্রথম জীবনে নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। মেধাবী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ এফ. এ পড়বার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসেন। রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তিনি বরানগরে মঠ স্থাপন করেন ও পরিব্রাজকরূপে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। সন্ন্যাসজীবনে নাম নেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোয় ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে যান। দেশে ফিরে তিনি বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক, বর্তমান ভারত, ভাববার কথা* প্রভৃতি। বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশ তাঁর অসামান্য কীর্তি। প্রাঞ্জল গতিশীল তেজোদীপ্ত ভাষা তাঁর গদ্যের বিশেষত্ব।

গালিলিও

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৪ গালিলিও পিসা-তে জন্মেছিলেন। সব দেশের বিজ্ঞানীর কাছে এঁর নাম সুপরিচিত। তাঁর জন্মের চারশো বৎসর পরে আজ সব দেশে সভাসমিতিতে তাঁর কথা ও জীবনীর আলোচনা হচ্ছে।

তাঁর পরিবারের নাম ছিল গালিলাই। পিতা পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাছাড়া সংগীতে ও গণিতে তাঁর দখল ছিল—নিজে Lute ভালো বাজাতে পারতেন। সংগীত তত্ত্বের উপর বইও লিখেছিলেন কয়েকখানি। প্রথমে ১৩ বৎসরের ছেলে গালিলিও গেলেন Vallam-brosa-র বেনেডিকটিন (Benedictine) সম্প্রদায়ের মঠে। দুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তবে শেষ অবধি মঠ ছাড়তে হল। বাপ বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, বেশি পড়াশোনা ক্ষতিকর। অবশ্য হয়তো মনে মনে একটু ভয়ও ছিল—ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়—সংসারের দিকে নজর দিতে কেউ থাকবে না তাঁর পরে। সচ্ছল অবস্থা আর নেই তাঁর। সংসারের হতশ্রীকে পুনরুদ্ধার করতে ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। আজ এখন গালিলিওর জীবনের সব কথা জানা দুষ্কর। তবে আমরা জানি, তিনি নিজে খুবই ভালোবাসতেন সংগীত ও চিত্রকলা। নিজের ইচ্ছা চালাতে পারলে হয়তো শেষ অবধি চিত্রকর হয়ে পড়তেন। তবে তা হল না। ১৫৮১ সালে সতেরো বৎসরে ঢুকলেন পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে। অভিভাবক ভেবেছিলেন এতেই অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে দর্শন পড়তে হত। তখন অ্যারিস্টটলীয় যুগ—সেই গ্রিক দার্শনিকের কথা সকলেই মাথা পেতে নেয় নির্বিচারে। সব জ্ঞান ও বিজ্ঞান শুরু হত ওই মনোভাবকে ভিত্তি করে। গালিলিও-র ঝোঁক কিন্তু অল্প বয়স থেকেই হাতেকলমে করে দেখতে—তাই তর্ক লাগত অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। কখনো কখনো শিক্ষকদের সঙ্গেও বেধে যেত বাক্‌যুদ্ধ। যুক্তি তর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারা জীবনে লক্ষ করবার জিনিস—এই স্বভাবই শেষ জীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হল। এই কাজ-পাগল কী করে বিশুদ্ধ গণিতের দিকে ঝুঁকল? গল্প এই —পরিবারের এক বন্ধু ছিলেন গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তিনি বিখ্যাত ছিলেন সে সময়—সকলে যেত তাঁর কাছে পড়তে। একদিন কোনো কাজে গালিলিও এসেছেন তাঁর বাড়িতে। তাসকানির (Tuscany) শাসকের পুত্র তখন সেই পণ্ডিতের কাছে পড়ছে। কাজেই গালিলিও অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সেই গণিতের ব্যাখ্যা। এই থেকে শুরু হল মনের প্রচণ্ড পরিবর্তন। সেই থেকে ডাক্তারি পড়ায় আনন্দ পান না। গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠল, গালিলিওর ডাক্তারি পড়া হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি আর পেলেন না। পারিবারিক নানা কারণে গৃহস্থালী ফ্লোরেন্সে (Florence) উঠে এল। বাবার অর্থ সামর্থ্য নেই ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়ান। কাজেই গালিলিও চলে এলেন ফ্লোরেন্সে। এখানে সেই সভাপণ্ডিতের কাছে পড়তে শুরু করেলেন—গণিত ও পদার্থবিদ্যা। অদ্ভুত তাঁর অধ্যবসায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে

ফেলে গেলেন অনেক পিছনে। এই বিদ্যায় ও অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠা এল—নানা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি এই নিয়ে মেতে আছেন, উদ্ভাবন করছেন নানারকমের যন্ত্র এবং নানারকম পরীক্ষাও শুরু হয়েছে তাদের সাহায্যে। নবীন বিজ্ঞানীকে প্রথমে ভুগতে হয়েছিল অর্থকষ্টের জন্যে। ছেলে পড়িয়ে রোজগারের চেষ্ট া ছিল, কিন্তু তাতে অল্পই আয় হত সে সময়। তবে ১৫৮৮ সালে দেখি, 'পিসা' বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকতা করছেন। আয় মাত্র ৬০ Scudi। একজন হিসাব করে বলেছেন—বর্তমানের হিসাবে এটা ৯০০-১০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের সামিল হবে। এতে পরিবারের সব খরচ চালানো দুষ্কর। তখন এদেশের মতো ইটালিতে একান্নবর্তী পরিবারের যুগ। বাপ আবার মারা গেলেন ১৫৯১সালে। গালিলিও হলেন কর্তা। সকলের ভার বইতে হল—মা, দুই বোন। ছোটো ভাই মাইকেল এঞ্জেলো (Michael-Angelo) (ইনি বোধহয় গান-বাজনা নিয়েই সময় কাটাতেন) বিদেশে চলে গেলেন এবং পোল্যান্ডে রাজদরবারে কলাবিদ্ হলেন। বাড়িতে—ফ্লোরেন্সে রয়ে গেল তাঁর স্ত্রী ও সাতটি ছেলে-মেয়ে। গালিলিওকে তাঁদেরও দেখতে হত। এই জন্য সারাজীবন দেখা যায় গালিলিও একদিকে যেমন মহানুভব, পরের কথা ভাবছেন—অপরদিকে চাইছেন, কী করে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। তার জন্যে করতে চাইছেন ব্যবসা, নানা স্থানে উমেদারি করছেন—ছুটাছুটি করছেন ও কর্মস্থল পরিবর্তন করছেন। যদিও মন তাঁর ফ্লোরেন্সকেই ভালোবেসেছিল। সেখানেই তিনি থাকতে চাইতেন সারাজীবন। ফ্লোরেন্সকে যে জানে, সেই বুঝবে তাঁর শিল্পী মন ওই মহিমাময়ী নগরীর প্রতি কেন এত বেশি আকৃষ্ট ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অনটন বাড়ল। তখন ১৫৯২ সালে এলেন পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভূমি তাসকানি ছেড়ে। এখানেই শুরু হল তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন। তবে চাপও পড়ল খুব বেশি—বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা তো আছেই, তাছাড়া দেশ রক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। আবার ফ্লোরেন্সকেও ভুলতে পারলেন না। ফ্লোরেন্সে আসতেন প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে। এখানকার Duke-এর ছেলে Cosmo তাঁর প্রিয় ছাত্র। তাঁর মা আবার বিশ্বাস করতেন ফলিত জ্যোতিষে—রাশিচক্র কেটে ভবিষ্যৎ গণনায়। তাঁর মন জুগিয়ে তাও করতেন গালিলিও সময় সময়। যদিও এতে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন কিনা বলা শক্ত। নিজে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসে গভীর বিশ্বাসী। অবশ্য তখনও সর্বত্র টলেমির যুগ চলছে। ফলিত জ্যোতিষের রাশিচক্র গ্রহণক্ষত্র সবই অচল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এই পরিবেশে গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও গণনা টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গালিলিও নতুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ুয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন—কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে। প্রচুর লোক শুনতে আসছে এই সব মনোজ্ঞ বক্তৃতা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৮ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। Venice-এর সরকার তাঁর উপর খুশি। ১৬০৪ সনে আরও ৬ বৎসরের মেয়াদ বাড়ল শিক্ষকতার। এই সময় তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানাল না।

১৬০৯ সালে ঘটল এক নতুন ব্যাপার—হল্যান্ডে একজন কাচের লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দু-পাশে রেখে দেখলেন, দূরের জিনিস এভাবে বড়ো দেখায়—মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিওর কাছে এই খবর পৌঁছাল। তিনি কাগজে প্ল্যান এঁকে আলোর রেখাপথের বিষয় বিচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হল। তিনিও দূরবিন তৈরি করতে পারলেন—এটি আরও ভালো ও শক্তিশালী হল। হল্যান্ডে লোকটি দেখছিল—সব উল্টো দেখায় তাঁর দূরবিনে। গালিলিও করলেন যে

যন্ত্র, তার সাহায্যে সব জিনিস যথারীতি অবস্থিত দেখায়, উল্টোপাল্টা হয় না। Venice-এ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কদর বেড়ে গেল। সমুদ্রপথে Venice-এর নৌবাহিনী তখন ঘুরে বেড়ায়, নানা দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে এনে ইউরোপে নানা স্থানে বেচা-কেনা করে—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মতো তখন Venice শহরের সম্পদ। মধ্যে মধ্যে এর নৌবহরকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হত। আগে থেকে শত্রুকে দেখা গেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি যথাসময়ে করা সম্ভব। তাই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন—এই দূরবিন সব জাহাজেই বসাতে হবে। গালিলিওর উপর ভার পড়ল-দূরবিন জোগান দেবার। গালিলিও রাজি হলেন—বাড়ি হয়ে উঠল ফ্যাক্টরি কারুশালা। সেখান থেকে প্রচুর দূরবিন বিক্রি হতে লাগল। তৈরির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রেরও নানা উন্নতি হল। নতুনগুলি হল আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এবার গালিলিও পেলেন হাতের মধ্যে বিশ্বসমীক্ষার এক প্রধান যন্ত্র। আকাশের দিকে ফিরিয়ে গালিলিও অনেক নতুন দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আগে এসব মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। চাঁদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ চোখে ধরা পড়ল, আবার এল নতুন নতুন উপগ্রহের খবর। আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র চন্দ্রমা। গালিলিও দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপগ্রহ ঘুরছে। তখনকার দিনে ধার্মিক পন্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা ভাবলেন—এইভাবে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে গালিলিও অন্যায় করছেন। দূরবিনের মধ্যে কোন জাদুর বলে বৃহস্পতির চাঁদের ছবি পড়েছে, যা চোখে দেখা যায় না—তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন হলে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজি। ধার্মিকেরা মত পরিবর্তন করলেন না ও পাছে তাঁদের বিশ্বাস টলে যায়, এই ভয়ে দূরবিনের ভিতর দিয়ে দেখতেও চাইলেন না। এতে গালিলিওর আমোদ লাগল। একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক, যিনি দূরবিনের ব্যবহার করতে চাননি, কাজেই বৃহস্পতির উপগ্রহে অবিশ্বাসী ছিলেন, মারা গেলেন। সেই সময়ে গালিলিও রহস্য করে বললেন—হয়তো এবার যাবার সময় 'চন্দ্রগুলি' দেখতে পাবেন। গালিলিওর নাম তখন দেশে দেশে অভিনন্দিত হচ্ছে। Venice-এর রাজ সরকারের কাছ থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না। অথচ মাথার মধ্যে অনেক নতুন নতুন কথা ভেসে উঠছে—নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চান, কিন্তু সময় পান না একাগ্র মনে এইসব বিষয় ভাবতে। অথচ সংসারে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই ১৬০৯ সালে যখন Tuscany-র বৃদ্ধ ডিউক মারা গেলেন ও তাঁর ছাত্র Cosmo সেই গদিতে বসলেন, তখন তিনি ভাবলেন হয়তো এঁর কাছে যেতে পারলে তিনি আকাঙ্ক্ষিত অবসর পাবেন নিজের কাজ করতে, অথচ অর্থেরও কোনো অভাব থাকবে না। তাই ভিতরে ভিতরে চেষ্ট া করতে লাগলেন দরবার করতে নতুন ডিউকের কাছে। এই সময় ফ্লোরেন্সের এক বন্ধুকে লেখা চিঠির থেকে কয়েক লাইনের সারাংশ উদ্ধৃত হল :

'এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে যে বেশি অবসর পাব নিজের কাজ করতে, তা মনে হয় না। কারণ বক্তৃতা দিয়েই পয়সা রোজগার করতে হবে সংসার চালাতে। পাডুয়া ছাড়া অন্য কোনো শহরে গিয়ে অধ্যাপনা করতে ইচ্ছাও হয় না নানা কারণে। অথচ অবসর না পেলে কাজও এগোবে না।

ভিনিসে গণতন্ত্র—যতই এরা উদার বা মহানুভব হোক, বাঁধা কর্তব্য করা ছাড়া এদের কাছে বৃত্তি আশা করা বৃথা। যতদিন পারি এই গণতন্ত্রে বক্তৃতা ও লেখাপড়া চালাতে হবে—যা এখানকার লোকেরা চায়। মাইনে পেলে আর অবসর মিলবে না; অর্থাৎ যে অবসর ও অর্থানুকূল্য আমি চাইছি, সে কোনো এক দেশের স্বতন্ত্র রাজার কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।'

আবার অন্যত্র লিখেছেন—'রোজ রোজ নানা উদ্ভাবন করা যাচ্ছে। অবসর ও সাহায্য পেলে অনেক বেশি পরীক্ষা ও আবিষ্কার করতে পারব।'

এক বৎসর ধরে এই ধরনের কথাবার্তা চালালেন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সঙ্গে। শেষে ১৬১০ সালে শরৎকালে Tuscany-এর নতুন Grand Duke নিজের পুরোনো গুরুকে আশ্রয় দিলেন—১০০০ Scudy মাইনে প্রতি বৎসর। তাছাড়া রাজপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে স্বর্ণপদকে বিভূষিত হলেন তিনি। পাডুয়া ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেলেন গালিলিও।

এবার বিজ্ঞান সেবার প্রচুর অবসর মিলল। তবে যেসব নতুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের বিষয়, তাতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে হইচই বেঁধে গেল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। তাছাড়া আর এক কারণে তাঁর সব আবিষ্কার ও মতামত শুধু পণ্ডিতমহলে আবদ্ধ রইল না। শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য গালিলিও ধরলেন এক নতুন পন্থা। পণ্ডিতমহলে চালু Latin ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন—নিজের আবিষ্কার ও মতবাদ—ইটালিয়ান ভাষায়। ইটালির মধ্যে যাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, এমন সব লোকই যাতে পড়তে পারে। ১৬১২ সালের মে মাসে তিনি চিঠিতে লিখলেন :

'আমি দেখি যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে—হচ্ছে ডাক্তার, দার্শনিক বা অন্য কিছু—যাহোক একটা উপাধি হলেই হল। তারপর এমন কাজে তারা নামে, যার জন্যে তারা একেবারেই অপটু। এদিকে যারা সত্য-সত্যই উপযুক্ত লোক, তারা কাজের মধ্যে থেকে কিংবা দৈনিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আর জ্ঞানের চর্চা করতে পারে না। এরা মেধাবী, কিন্তু তাঁরা সাধুভাষা (Latin) ইত্যাদি বোঝে না। তাই সারাজীবন তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থেকে যায় যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই এমন সব মহামূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা তাদের কাছে একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি চাই তাঁদের মধ্যে এই সত্য জ্ঞানের উদ্বোধন করতে যে, বিশ্বপ্রকৃতি সকল মানুষকে চোখ দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তাঁর মর্মকথা সকলে বুঝতে পারে ও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।'

নিজের দূরবিন নিয়ে গালিলিও অনেক নতুন আবিষ্কার করলেন। চাঁদের পর্বতমালা, বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ, সূর্যবিম্বে কলঙ্কবিন্দু, শুক্র গ্রহের চন্দ্রের মতো ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শনির বলয় ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস। এইভাবে নিজের চোখে গ্রহমণ্ডলের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, যার সত্যতা যে কেউ দূরবিনের সাহায্যে নিরূপণ করতে পারবে। কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হল। যুক্তিবাদী গালিলিও ভাবলেন, এইসব কথা প্রকাশ করলে সকলকেই তাঁর স্বপক্ষে আনতে পারবেন। তাই সে বিষয়ে বইও লিখলেন তিনি। তা সত্ত্বেও সনাতনীরা কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। একদিকে ফ্লোরেন্সের ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক ও ছাত্রেরা, যাঁরা এইসব নতুন মত মানতে পারলেন না কিংবা যাঁরা তাঁর যশোপ্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম গালিলিও তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতেন, এতে তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়ল। ধর্মযাজকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, গালিলিওর অধ্যাপনা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, বাইবেলের অনেক কথার সরাসরি বিরুদ্ধে। তাঁরা গোপনে অভিযোগ করলেন—গালিলিও ধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করছেন; বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করতে চাইছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম্ভ করল। প্রথমে Inquisition রায় দিলেন যে, সূর্য যে জগতের কেন্দ্র স্বরূপ—এটি অযৌক্তিক এবং যথার্থ ধর্মমতের পরিপন্থী—কারণ এই মত বাইবেলের অনেক লেখার সঙ্গে মিলবে না, যা এতকাল ধার্মিক যাজক ও পন্ডিতেরা শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন—পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ধারণা প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ১৬১৬ সালে মার্চ মাসে কোপারনিকাসের বই ও তৎসম্পর্কিত আরও দুইটি বইয়ের প্রচার তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্মা পোপের কাছে এই খবর পৌঁছে দিলেন।

পোপ আদেশ দিলেন কার্ডিনাল বেলারিমিন যেন গালিলিওকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন—তিনি যেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করেন, আর তা যদি তিনি না করতে চান তো বিধিমতো তাঁকে আদেশ দেওয়া হবে, যাতে তিনি এই মত প্রচার বা আলোচনা বন্ধ করেন। যদি তাতে তিনি অস্বীকৃত হন তো তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। ১৬১৬ সালে গালিলিওর রোমে ডাক পড়ল। বেলারিমিন ছিলেন গালিলিওর হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ। জ্যোতিষ শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য আবিষ্কারে গালিলিও তখন নাম করেছেন। জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিসাম্যের বিষয়ে ভাবছেন। আবার গতিবিজ্ঞানে অনেক নতুন কথাও তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় থেকেই। তাই কার্ডিনাল বেলারিমিন ডেকে আনলেন গালিলিওকে নিজের প্রাসাদে। বুঝিয়ে বললেন—কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তর্ক না করেন বা বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নিজের মত ও তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা না করেন। গালিলিও রাজি হলেন, তবে তিনি ভাবলেন এখনো গণিতের কল্পনা হিসাবে হয়তো কোপারনিকাসের কথা আলোচনা করা যাবে কিংবা যুক্তি তর্ক দিয়ে টলেমি ও কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ আলোচনা চলতে পারবে। তাই তার পরও তিনি যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের বই লিখলেন, গতির কথা বা ভাসমান বস্তুর স্থিতিরহস্য—সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের আকারে দুই মতবাদের আলোচনা করে বই লিখে ছাপাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পোপ ও বেলারিমিন মারা গিয়েছেন। নতুন আর একজন পোপের পদে অধিষ্ঠিত। এক সময়ে গালিলিও ভাবতেন—ইনি বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তাই ভেবেছিলেন নতুন বই প্রকাশে অনুমতি মিলবে। কিন্তু হল হিতে বিপরীত, নানা কারণে তিনি নতুন পোপের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। শেষে গালিলিওর ডাক পড়ল—১২ এপ্রিল তিনি কারারুদ্ধ হলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ৩০ এপ্রিল গালিলিওকে স্বীকার করানো হল যে, যা কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকথনের ছলে লিখেছেন— সে সবই তাঁর বৃথা গর্বের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার নিদর্শন। তাঁর নির্যাতনের এইখানেই শেষ হল না। তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হল যে, তিনি কোপারনিকাসের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের সামনে অনুতাপব্যঞ্জক সাদা পোশাক পরে তিনি হাঁটু গেড়ে রইলেন। বিচারকেরা বললেন—'তোমার ভুল দেশের ভয়ানক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে। আমাদের আদেশে তোমাকে কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তোমাকে রাখতে চাই, তাছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে অনুতাপসূচক প্রার্থনা করতে হবে।' এর দুদিন বাদে Inquisition তাঁকে ফ্লোরেন্সের দূতাবাসে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তাঁকে সিয়েনাতে (Siana) Archbishop-এর নজরবন্দী করে রাখা হল। তার পর ফ্লোরেন্সের শহরতলিতে নিজের গৃহে অন্তরীণ রইলেন।

দুঃখে-কষ্টে গালিলিওর জীবনের শেষ ৯ বৎসর কাটল। তখনও বিজ্ঞানের নতুন কথা ভাবতে চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে। যে মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করত এই দুঃখকষ্টের মধ্যে সেও মারা গেল। নিজে অন্ধ হয়ে যেতে বসলেন। শেষের পাঁচ বৎসর একটু বন্ধন ঢিলে হল—কিছুটা বাধানিষেধের হাত

থেকে অব্যাহতি পেলেন পোপের করুণায়—নানা দেশ থেকে তখন তাঁকে দেখতে আসত, তাঁর বই ও লেখা অবৈধ ভাবে অন্য দেশে চালান ও ছাপা হয়েছে। খ্যাতি ও সহানুভূতি ছিল সেই খ্রিস্টীয় মহলে, যাঁরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মপন্থী ছিলেন না। সর্বশেষে ৮ জানুয়ারি ১৬৪২ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

প্রবাদ আছে যে, Inquisition বিচারকদের সামনে হাঁটু-গাড়া থেকে যখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন—তখন নাকি তিনি বলেছিলেন— ‘এ সত্ত্বেও পৃথিবী চলমান।’ কিন্তু এটা হয়ত গল্প কথা। সনাতনী ধার্মিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি। ফলে ইটালি দেশই পিছিয়ে পড়ল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে গালিলিওর আজন্ম সাধনা সুফল প্রসব করল।

গালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন নিজে পরীক্ষা, বিচার ও যাচাই করে নিতে হবে সব সত্যকে—শুধু আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করে জীবনকে গড়ে তুললে ভুল হবে। ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যাঁতায় গুঁড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ রইল না।

চারশত বৎসর বাদেও তাঁর প্রতি নানা লোকের ভক্তির অর্ঘ্য সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে। ‘সত্যমেব জয়তে’।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) : জন্ম কলকাতায়। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ। পরমাণুবিজ্ঞানে তাঁর অবদান সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর সংযোগে উদ্ভূত হয়েছে ‘বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স্’। পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত সত্যেন্দ্রনাথ সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যচর্চাও করেছেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *শিক্ষা ও বিজ্ঞান*, *শিল্প ও বিজ্ঞান*, *দেশবিদেশের বেতার চর্চা*, *বিজ্ঞানের সংকট* প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি *ছোটো বুটির গোলা* কিংবা *জাহাজডুবি*’র মতো সুখপাঠ্য ছোটোগল্প রচনা করেন।

কবিতা

নীলধ্বজের প্রতি জনা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

একাদশ সর্গ

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি;
হ্রেষে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু! মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য!—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি-নিনাদে!
টুট কিরীটির গর্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূলদণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে।
নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম, ক্ষত্রকর্ম সাধ ভুজবলে।

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায় কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমন তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণ তম সরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,—
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে

এ কাহিনি,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে, রাজা, ভক্তি ভাবে; —এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান, — তাও কি নাশিলি?
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনি? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসূত ব্যাস বিখ্যাত জগতে।
ধীবর জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে,
ধর্ম্মমতি! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য তিনি
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশড়ির যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?
জানি আমি কহে লোক রথিকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ, সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীন! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয়-যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি

বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন, নানান যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি!—
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুলবধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে!
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে! যাচি চির-বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি!

ইতিশ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জনা-পত্রিকা নাম একাদশ সর্গ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) : জন্ম বাংলাদেশের যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টি শুরু করে মধুসূদন black verse-এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যে যুগান্তর আনেন। গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল *মেঘনাদবধ কাব্য।* তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী।* তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল *শর্মিষ্ঠা , পদ্মাবতী, মায়াকানন, কৃষ্ণকুমারী* প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* ও *একেই কি বলে সভ্যতা* নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন।

বাড়ির কাছে আরশিনগর

লালন ফকির

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
ও এক পড়শি বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে —
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।
বলব কি সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শি যদি আমায় ছুঁত
আমার যম-যাতনা যেত দূরে।
আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) : জন্ম বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভাঁড়ারায় (মতান্তরে ঘোড়াই)। উদারধর্মীয় সাধক লালনের ধর্মীর পরিচয় নিয়ে মতান্তর আছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ না-মানা লালন তাঁর বাউল গানের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর গানগুলির মধ্যে ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’, ‘সবলোকে কয় লালন কী জাত’, ‘বাড়ির কাছে আরশিনগর’ — প্রভৃতি আজও জনপ্রিয়। ঠাকুর পরিবারের জমিদারি শিলাইদহের প্রজা হওয়ায় তিনি তাঁদের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

কাজী নজরুল ইসলাম

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্যবেদির শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন — 'দেড় শত বছর।'...

সপ্ত সিন্ধু তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখান হ'তে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হ'ল কি রক্ষ-পুর?

যক্ষপুরীর রৌপ্য পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
কামান গোলার সিসা স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশমহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?

তবে এ কীসের আর্ত আরতি,
কীসের তরে এ শঙ্খারাব?...

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে
আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানল হ'তে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় শৌখিন পূজারি, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছে ফুঁ,
পুণ্যবেদির শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারি, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যেথা বন্দিনী সীতা-সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,
বাণীর মুক্ত-শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারি সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী-পূজা-উপাচার বহি'?

সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কাল বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!

তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ ?
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ ?
তবে তাই হোক ! ঢাক' অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ !
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'সাপ্তাহিক বিজলী'পত্রিকার ৬ জানুয়ারি সংখ্যায় *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এবছরই তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিবীণা, চক্রবাক, চিত্তনামা, ছায়ানট, জিঞ্জীর, ঝড়, দোলনচাঁপা, নতুন চাঁদ, নির্ঝর, পুবের হাওয়া, প্রলয়শিখা, ফণীমনসা, বিষের বাঁশি, সর্বহারা, সাম্যবাদী* প্রভৃতি। 'সঞ্চিতা' তাঁর কবিতার এক অসামান্য সংকলন। *সওগাত, মোসলেম ভারত, নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হয়। বাংলা গানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

নুন

জয় গোস্বামী

আমরা তো অল্পে খুশি; কী হবে দুঃখ করে?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাতকাপড়ে।

চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধারদেনাতে
রাত্তিরে দু-ভাই মিলে টান দিই গঞ্জিকাতে

সব দিন হয় না বাজার; হলে, হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা

কিন্তু পুঁতব কোথায়? ফুল কি হবেই তাতে?
সে অনেক পরের কথা। টান দিই গঞ্জিকাতে।

আমরা তো এতেই খুশি; বলো আর অধিক কে চায়?
হেসে খেলে, কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়

মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুররাতে
খেতে বসে রাগ চড়ে যায়, নুন নেই ঠান্ডা ভাতে

রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি
বাপব্যাটা দু-ভাই মিলে সারাপাড়া মাথায় করি

করি তো কার তাতে কী? আমরা তো সামান্য লোক
আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক।

জয় গোস্বামী : জন্ম ১৯৫৪, কলকাতায়। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতার বই ‘প্রত্নজীব’, ‘উন্মাদের পাঠক্রম’, ‘ভুতুমভগবান’, ‘ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?’, ‘বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা’, ‘পাগলী তোমার সঙ্গে’, ‘সূর্য পোড়া ছাই’, ‘হরিণের জন্য একক’, ‘ভালোটি বাসিব’, ‘হার্মাদ শিবির’, ‘গরাদ! গরাদ!’ প্রভৃতি। ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল’ তাঁর স্মরণীয় কাব্য-উপন্যাস। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ‘সেই সব শেয়ালেরা’, ‘সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা’ প্রভৃতি। বাংলা কবিতার আলোচনায় তাঁর লেখা ‘আকস্মিকের খেলা’, ‘আমার রবীন্দ্রনাথ’, ‘গোঁসাইবাগান (তিন খণ্ড)’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আন্তর্জাতিক

গল্প